পি এইচ. ডি. ডিগ্রি উপাধি লাভের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে (নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. গোপা দত্ত

সহ-তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র বসু

গবেষক

স্বপন বর্মন

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1200516

বর্ষ: ২০১৫-২০১৬

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্য সমাজের নবজাগরণের মূলে আছে ‘ইউরোপ’। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ইতালিতে সূচনা হয়ে পরবর্তীকালে জার্মানিতে রিফরমেশন ও ফরাসি বিপ্লব হয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব সংঘটিত করে, যা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই সময় ইউরোপ বিভিন্ন মহাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হয়, বিশেষ করে এশিয়া ভূখণ্ডের জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান আরোহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’(১৭৮৪) ‘ইউরোপীয় কাউন্টার পার্ট’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে ‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’ (১৮০০), ‘হিন্দু কলেজ’ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিও–র মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বঙ্গসংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের রক্ত সঞ্চার করেছিল। এতদিনের মধ্যযুগীয় জন্মপ্রদত্ত গণ্ডি অতিক্রম করে বঙ্গীয় তরুণ জাতকেরা সেদিন হতে চেয়েছিল বিশ্বসংস্কৃতির যাত্রী, মুক্তপথের পথিক। এইভাবে উনিশ শতকে বাংলার সাহিত্য ও সমাজে, কর্মে ও মননে বাঙালি যে অজস্র চরিতার্থতায় নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিল তার মূল কারণ ছিল ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের লেখায় প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ কীভাবে এসেছে তা দেখানোই আমাদের গবেষণার অভিপ্রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপ মহাদেশের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে বাঙালির যেভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আর অন্যত্র সেভাবে নয়। তাই আমরা আমাদের গবেষণা কর্মে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি।

গবেষণা পত্রের শিরোনাম ও অধ্যায় ভাবনা

শিরোনাম:

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে (নির্বাচিত) ইউরোপ প্রসঙ্গ

অধ্যায় ভাবনা

প্রথম অধ্যায়: ঔপনিবেশিক কালপট

বাঙালির সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী

বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় হাতছানি

তৃতীয় অধ্যায়: রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য

অনুবাদের আস্বাদনে ইউরোপ

চতুর্থ অধ্যায়: কল্লোলযুগের বাংলা কথাসাহিত্য

মনস্তাত্ত্বিকতায় ইউরোপ

পঞ্চম অধ্যায়: প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ

ষষ্ঠ অধ্যায়: ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম

ব্যঙ্গ-কৌতুকে ইউরোপ

সপ্তম অধ্যায়: দিলীপকুমার রায়

অষ্টম অধ্যায়: অন্নদাশঙ্কর রায়

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়:

ঔপনিবেশিক কালপট

বাঙালির সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সাধন।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালিরা ভ্রমণ পিপাসু। আমরা একাধিক শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ থেকে বাঙালিদের সমুদ্র যাত্রার নিদর্শন পেয়ে থাকি। কিন্তু পরবর্তীকালে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সমুদ্রযাত্রা ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমুদ্রযাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধর্মীয় অনুষঙ্গ– যা কালাপানি পার হয়ে সমুদ্র যাত্রায় যাওয়া মানেই সমাজ নিষিদ্ধ কাজ বলে মনে করা হত। তবে এই বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সমাজের আর্থিক দিক থেকে নিচুতলার কিছু মানুষ কিন্তু বিলেত যেতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতকে সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া কিছু মানুষজন বাংলা থেকে বিলেত তথা ইউরোপে গিয়েছিলেন দাস হয়ে। শুধু বাংলা নয়, তখন সারা ভারতেই দাস প্রথার রীতিমত চল ছিল। আসলে দাস বা ক্রীতদাসের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মানুষ মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল কেবলমাত্র মুনাফার লোভে। তবে এদেশের দাস প্রথার ব্যাপারে পর্তুগীজরা পথিকৃৎ। কারণ আরাকান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সন্দ্বীপ, হুগলী, বজবজ সর্বত্র পর্তুগীজ হার্মাদ আর বোম্বেটেরা বছরের পর বছর মায়ের কোল, গৃহস্থের সংসার শ্মশান করে বেড়িয়েছিল। আমরা জানতে পারি, ১৭৬০ সালে বজবজের কাছাকাছি আক্রাতে তাদের একটা ‘দাস গুদাম’ তৈরি করেছিল। মগেরাও ছিল তাদের মতো। বাংলার সন্তানেরা সেসময় কুড়ি থেকে সত্তর টাকায় সেদিন ইংল্যান্ডের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হতে থাকে তাদের হাতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপ থেকে এদেশে সাধারণত ইংরেজ পুরুষরাই আসতেন। কিন্তু নারী বা যুবতীরা আসত কালেভদ্রে। এই অভাবের দরুণ সাহেব-সুবাদের মধ্যে দেশীয় উপপত্নী রাখার প্রচলন অধিক পরিমাণে ছিল। আমরা উদাহরণ স্বরূপ দ্বারকানাথের ইংরেজি শিক্ষক শেরবোর্ণ এর পিতার কথা বলতে পারি, যিনি বিবাহ করেছিলেন এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে। এভবে উনিশ শতকে ক্রমশ বিলেত তথা ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর পরবর্তীকালে ভারতফেরত ইংরেজ ‘নবাব’দের ইউরোপের মাটিতে একজন ভারতীয় ভৃত্য বা আয়া রাখা একটি ফ্যাশান ও আভিজাত্যে পরিণত হয়ে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকে আয়া বা গৃহভৃত্যের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বেশি লোক জাহাজের খালাসি, সারেং, লস্কর বা নাবিক হয়ে ইউরোপে যেতেন। লস্করদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে বিলেত যাওয়ার কাজও খুব সহজ ছিল না। তাদের ওপর জাহাজের মালিকেরা নানা রকম অত্যাচার করতেন, এমনকি জানতে পারা যায় কোনও কোনও জাহাজের ক্যাপ্টেন লস্করদের মেরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতেন। এর পরেও লস্কররা অনেকটা জেনে বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ইউরোপে পাড়ি দিতেন। এই সময়ের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় চাষি এবং সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় লস্করের কাজে অর্থ উপার্জন ছিল অনেকটাই বেশি। বিলাত তথা ইউরোপে পৌঁছানোর পরও লস্করদের জীবন যে, খুব আরামদায়ক ছিল তা নয় - তা আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানতে পারি। তাঁরাও আয়া বা ভৃত্যের মতোই অনেক কষ্টে তাঁদের জীবন যাপন করতেন। উল্লেখ্য, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত যে সমস্ত ভ্রমণকারীরা ইউরোপে গেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই 'মুসলিম' সম্প্রদায়ের মানুষ। কারণ আমরা দেখেছি বাঙালিদের মধ্যে মুসলমান সমাজের বিধিনিষেধ তেমন শক্ত ছিল না।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাঙালিদের মধ্যে কালাপানি পার হয়ে ইউরোপে যাওয়ার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়ই মনোভাবের পরিবর্তনের কারণ হল এসময় কলকাতা নগরীতে হিন্দু কলেজসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারে— চাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি রক্ষা, ধনশালী হওয়া সহ একাধিক ইহলৌকিক নানা সুবিধা পেতে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসতেই হবে। এ প্রসঙ্গে দুই প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তি রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলা যেতে পারে। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার ইহলৌকিক সুবিধা ছাড়াও বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের কূপমণ্ডুকতা দ্বারা আচ্ছন্ন বাঙালি প্রজন্মকে উনিশ শতকে নতুন আলোর দিশা দেখাতে চেয়েছিলেন। ফলত এই জাগ্রত চিন্তা-চেতনার দ্বারা লালিত হয়েই পরবর্তীকালে একাধিক মুক্তমনা মানুষ সাতসমুদ্রের কালাপানি পার হয়ে ইউরোপ ভ্রমণের শুধু স্বপ্নই দেখেন তা নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ভ্রমণ করেন ও পরদেশে জীবন অতিবাহিত করেন। এরকমই দুজন বাঙালি ব্যক্তি হলেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী

বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় হাতছানি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাকাল ১৮৬২ সাল এবং শেষ তথা চতুর্দশতম উপন্যাস 'সীতারাম' এর প্রকাশ ১৮৮৭ সাল, অর্থাৎ বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। কিন্তু বঙ্কিমের এইসব উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট বা সলতে পাকানোর মনীষা তৈরি হয়েছিল এই শতাব্দীরই প্রথমার্ধ থেকে। এই সময় রামমোহন রায়, নব্যবঙ্গের দল (ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও ও মেকলে প্রধান তিন দীক্ষাগুরু) ও ডিরোজিওর অনুগামীদের মতো একাধিক আধুনিক চিন্তানায়কেরা ইংরেজি শিক্ষা ও যুক্তি দিয়ে আমাদের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় ফাটল ধরিয়ে দেন। অন্যদিকে 'ধর্মসভা'র দ্বারা আকৃষ্ট দেশীয় সমাজের পণ্ডিতেরা চাইতেন আমাদের পুরানো সমাজকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে। আবার 'তত্ত্ববোধিনী' সভা এ দুইয়ের মধ্যস্থায় চলতে চেয়েছিল। বঙ্কিম এই সময় তাঁর ছাত্রাবস্থা কাটিয়েছেন এবং ১৮৫৮ সালে বি.এ. পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কলেজের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ছিল নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, গণিত এবং ইংরেজি সাহিত্য। উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশিষ্ট যুক্তিবাদ, বিকাশ, বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্য তাকে মনে-প্রাণে আকৃষ্ট করেছিল, যা তিনি লব্ধ করেছিলেন ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র চর্চার দ্বারা; যদিও পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচ্য দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যেকর্মে এই চিন্তা-চেতনার একাধিক পরিচয় পেয়ে থাকি।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও তিনি অকপটভাবে ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিকদের নাম ও তাঁদের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আবার কোথাও বা পরোক্ষে সে কথা স্বীকার করেছেন; তা উপন্যাসের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা অংশে হোক বা পরিশিষ্ট অংশেই হোক। যেমন 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকাংশে লর্ড লিটন ও উইলকি কলিন্সের কথা স্বীকার

করেছেন। আবার ইউরোপীয় উপন্যাসের ‘এপিগ্রাফে’র ন্যায় ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের শুরুতে চারটি খণ্ড মিলিয়ে মোট ৩১টি পরিচ্ছেদের ১৩টি পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়র, বায়রন, কীটস্ প্রমুখের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কয়েকটি উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপীয় প্রসঙ্গের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সতোরো বছর বয়সে ইংল্যান্ড যাত্রার সময় থেকেই তাঁর মন পশ্চিমাভিমুখী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই তাঁর মনে পূর্বের ভিত্তির উপর পশ্চিমের ইমারত গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি-সম্পর্কিত কৌতূহলের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘... হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুডুবু খাইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমার মেজোবৌঠাকরুণ তখন ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেছিলেন— তাঁহার আশ্রয় গিয়া বিদেশের প্রথম ধাক্কাটা আর গায়ে লাগিল না। ...’[১] আর পাঁচজন বাঙালির মত আশা ছিল রবীন্দ্রনাথেরও ‘কথা ছিল, পড়াশুনা করিব, ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইলাম।’[২] কিন্তু ব্যারিস্টার হওয়ার আগেই তাঁর পিতা তাঁকে দেশে ডেকে বাড়ি ফেরান। পরবর্তীকালে তাঁকে আবারও ব্যারিষ্টারি ডিগ্রির জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে বিশেষ কারণে মাদ্রাজের ঘাট থেকে নেমে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি বিলাতসহ সারা পৃথিবী একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেকথা আমরা তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’, ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’, ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’ ও বিভিন্ন চিঠিপত্রে পেয়ে থাকি। ফলে তাঁর জীবন ও সাহিত্যে ইউরোপ কখনও প্রত্যক্ষ ও কখনও পরোক্ষভাবে নানা প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর লেখা যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ প্রসঙ্গগুলি এসেছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল— ‘প্রায়শ্চিত্ত’(১৮৯৪), ‘নষ্টনীড়’(১৩০৮), ‘বলাই’(১৩৩৫), ‘রবিবার’(১৩৩৬), ‘রাজটিকা’ (১৮৯৮), ‘শেষকথা’(১৩৪৬), ‘ধ্বংস’(১৯৪১), ‘গোরা’(১৯১০) ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) প্রভৃতি।

উনিশ শতক জুড়ে একাধিক বাঙালি বিলেত তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন শিক্ষার্জনের জন্য। এমনকি এই শতকের শেষে অনেকেরই ধারণা হত যে বিলাতে না গেলে ভাল পড়াশুনা, ডিগ্রি, চাকরি, অর্থ-উপার্জন কোন কিছুই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের অনাথবন্ধুকে বলতে শুনি, "আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যাব না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"[৩] এমনকি পড়তে যাওয়ার অর্থ না থাকলে অনেকে বিয়ে করে শ্বশুরের অর্থেও বিলাতে পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই গল্পের অনাথবন্ধু, 'নষ্টনীড়' গল্পের অমল। 'রবিবার' গল্পেই আবার অভীক জাহাজের স্টোকার হয়ে বিলাতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে। 'বলাই' গল্পে আমরা দেখি, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে প্রথমে পিতা এবং পরে পুত্রকে নিয়ে বিলাতে পাড়ি দেন। গল্পকথকের ভাইপোর নাম বলাই। ছোটবেলা থেকেই সে কাকা ও কাকিমার কাছে মানুষ হয়েছে। কারণ কথকের বৌদি মারা গেলে তার দাদা তাদের কাছেই বলাইকে রেখে বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে যায়। দশবছর পরে দাদা বিলাত থেকে ফিরে তার ছেলে বলাইকেও বিলাতি শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। এই ভাবনা-চিন্তা থেকেই বলাইকে তার বাবা প্রথমে সিমলায় এবং পরে বিলাতে নিয়ে যায়। আবার 'ধ্বংস' গল্পটির প্রেক্ষাপট এবং চরিত্র উভয়ই ইউরোপীয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেক উপন্যাসে বিলাতি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার কথা বহুবিধ প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তাঁর 'কাহাকে'(১৯৯৮) উপন্যাসে সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের একটি নিপুণ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে আমরা ঈঙ্গবঙ্গ সমাজের সামাজিক মেলামেশার চিত্র, ইংরেজ শিক্ষাগর্বিত বাঙালি সমাজের আদব-কায়দা ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে থাকি। এই সমাজের স্বাভাবিক কথোপকথনের ভাষা ইংরেজি বলে এই উপন্যাসে একাধিক সংলাপ ইংরেজিতে লক্ষ করা যায়। আমরা উপন্যাসের কাহিনি সূত্র ধরে দেখাতে চেষ্টা করব অতীত ও বর্তমান কীভাবে মণির ভাবনা-চিন্তায় ও স্মৃতিপটে এক হয়ে গেছে। আর এক্ষেত্রে সেই সংযোগ সাধনের উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা পালন

করেছে বিলেত ফেরত রমানাথ ঘোষ নামে একজন চরিত্র। মণি তার ভগিনীপতির সম্পর্কে বলেছেন, 'ভগিনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজীয়ানা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়িতে ছোটখাট একটি স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলনী হইয়া থাকে।'[৪] মণির বিলাতফেরত রমানাথ সম্পর্কে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেও দেখা যায়। তিনি ভেবেছেন, 'ইংলন্ডে best manners যিনি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাতে সুরুচি বা ভদ্রতার অভাব সম্ভবে? আমারি অমার্জিত অশিক্ষিত রুচিবশতঃ তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতেছি না।'[৫] যৌবন বয়সে মণি বিলাতফেরত রমানাথের প্রতি ভালোবাসার মোহে আকৃষ্ট হয় একটিমাত্র গাওয়া গানে, যে গান সে ছোটবেলায় ছোটুর কণ্ঠে গুনগুন করে শুনেছিল; সেই গান। দিদির বাড়িতে টেনিস পার্টিতে বিলাতফেরত মিস্টার ঘোষের কণ্ঠে মণি এ গানটি শোনে। এদিকে বিলাতফেরত ব্যারিস্টার হওয়ায় তিনি সমাজে বিয়ের বাজারে রীতিমত সুপাত্র বলে পরিগণিত। মণির কথার জবাবে রমানাথ যা বলে তাতেও আমরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির কিছুটা আভাস পেয়ে থাকি।

তৃতীয় অধ্যায়:

রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য

অনুবাদের আস্বাদনে ইউরোপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', 'দাসী', 'সখা', 'মুকুল' ইত্যাদি পত্রিকায় আমরা অনুবাদমূলক গল্পের সন্ধান পেয়ে থাকি। একাধিক লেখকের অনুবাদ মূলক রচনা থেকে বাঙালি লেখক ও পাঠকের বিদেশি সাহিত্যের প্রতি ক্রমে অনুরাগ জন্মাতে থাকে। বিশেষ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকাটিতে অনেক বিদেশি গল্প অনুবাদের পাশাপাশি বিদেশি লেখকদের নিয়েও নানা আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়েই 'দাসী' (১৮৯৫) পত্রিকায় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যিক টলস্টয়ের 'জীবনোপায়' গল্পটি অনুবাদ করেন অপূর্বচন্দ্র দত্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফরাসি-প্রসূন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যে তিনি দোরিয়াক, মরে, গাবোরিয়ো, জোলা, মার্ক, শার্ল-গোলে, আলফঁস দোদে, দুমা, বালজাক, মোপাসাঁ প্রভৃতি লেখকদের গল্পের অনুবাদ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি, টলস্টয়ের গল্পগুলি একাধিকবার অনূদিত হতে থাকে। চারুচন্দ্র গুহর 'টলস্টয়ের গল্প' (১৯১৯), দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সপ্তর্ষি' (১৯২৩), শিশিরকুমার মিত্রের 'লোভের উৎপত্তি' (১৯২৩), 'বোকা আইভান' (১৯২৪) ইত্যাদি গল্প তাদের মধ্যে অন্যতম।[৬]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে একাধিক লেখকেরা 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬), হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) প্রমুখ। আজকের দিনে আমরা যাঁদের 'ভারতী গোষ্ঠীর লেখক' বলে থাকি। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা রবীন্দ্রানুরাগ ঐক্যসূত্রে একত্রিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই এই সময়ের কিছু তরুণ লেখকেরা বিদেশি উপন্যাসের বাংলায় ভাষান্তর করা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়– এঁরা সকলেই বিদেশি গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা সাহিত্য রচনা করেন।

ভারতী গোষ্ঠীর পূর্বে বিদেশি কথাশিল্পের সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যিকদের এমন ব্যাপক সংযোগ ছিল না। এই সংযোগ ঘটেছিল দু'ভাবে— বহু গল্প-উপন্যাসের সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে এবং বিদেশি গল্প-উপন্যাসের অনুসরণ বা অনুকরণ করে বাংলা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। গল্প-উপন্যাসের সরাসরি অনুবাদ হয়েছে মণিলালের 'জলছবি' (১৯১৯), 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১) সৌরীন্দ্রমোহনের 'অবন্ধনা', 'নতুন আলো', 'নবাব', 'মাতৃঋণ', 'অসাধারণ', 'পরদেশী'। তবে বিদেশি উপন্যাসের ভাষান্তরে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আগুনের ফুলকি', 'রবিনসন ক্রুশো' ইত্যাদি। বিদেশি গল্প-উপন্যাসের অনুসরণ বা অনুকরণে বাংলা উপন্যাস রচনাতেও চারুচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'জোড় বিজোড়' (১৯২৪, নুট হামসুনের 'ভিক্টটেরিয়া' অবলম্বনে), 'অদর্শনা' (১৯২৫, বালজাকের 'Lamour Masque' অনুসরণে), 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' (১৩৩০), 'চোরকাটা' (১৩২৬) ইত্যাদি।

আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে রবীন্দ্র সমসাময়িক এই সমস্ত একাধিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কিছু অনূদিত কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, এই সমস্ত অনূদিত গল্প ও উপন্যাসে ইউরোপ ঠিক কীভাবে এসেছে এবং বাংলার মৌলিক কথাসাহিত্য থেকে এগুলি কোথায় স্বতন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়:

কল্লোলযুগের বাংলা কথাসাহিত্য

মনস্তাত্ত্বিকতায় ইউরোপ

কল্লোল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে। এইসময় ভারত ও ইউরোপীয় জন-জীবন নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তায় ডুবে যায়। আর তার প্রভাব বাংলা তথা ভারত-ভূমিতে আছড়ে পড়েছিল। কারণ ভারত ছিল তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। ১৯১৪ - ১৯১৮ সালের সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের জীবন-চিন্তা ও নৈতিকতায় আসে প্রবল অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা ও বেদনার বেদগানের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল বাঙালি শিক্ষিত তরুণদের মনেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোল ঘেঁষে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল রুশ বিপ্লব। এই বিপ্লব (১৯১৭ - ১৯২১) চার বছরের মধ্যে সফলতা অর্জন করে। এই সময়ে মার্কসবাদ, ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্ববাদ ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে। ফলে একদিকে রুশ বিপ্লবের সফলতা, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী শূন্যতা ও হতাশার পটভূমি— এই দুইয়ের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকে ইউরোপ। মানুষ সেদিন ইতি থেকে নেতিতে, স্থির থেকে গতির দিকে, একের পরিবর্তে একাধিক বিকল্প খুঁজতে থাকে। ঠিক এই অবস্থায় বাংলার কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ঠিক কাকে আদর্শ হিসেবে এই সময় গ্রহণ করবেন, তাঁদের জীবন প্রত্যয় কী হবে তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমরা বিদেশি সাহিত্য বলতে কিছুটা ইংরেজি সাহিত্যকে আর কিছুটা ফরাসি সাহিত্যকে বুঝতাম। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের দ্বার খুলে দেয়, ফলে সাহিত্য ক্ষুধা যায় বেড়ে। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের বাইরেও যে ইউরোপীয় সাহিত্যের মহৎ ভাণ্ডার আছে তারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এবার ফরাসি, স্ক্যানডিনেভিয়ান, নরওয়েজিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান ও জাপানিজ ইত্যাদি সাহিত্য ইংরেজি অনুবাদে বাংলার বাজারে সহজলভ্য হয়ে উঠল। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হল কন্টিনেন্টাল সাহিত্য বিশেষত গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে

ফরাসি ও রুশ কথাসাহিত্য। সেইসঙ্গে লরেন্স, হাক্সলি, নুট হামসুন, গোর্কির সাহিত্য পাঠ। এই অবস্থায় তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন, ফলে তাঁদের সাহিত্যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরিবর্তে সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যাযাবর চরিত্র কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় তাঁরা উৎসাহী হন। তরুণ বাঙালি লেখকেরা যুদ্ধোত্তরকালে এই ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে পেয়েছিলেন বাস্তব জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌনচেতনাবোধ ও মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারে নতুন মূল্যবোধ। আর সেই নতুন মত ও পথ তরুণ লেখকেরা বেশি করে পেয়েছিলেন গোর্কি, হামসুন, টুর্গেনিভ, চেখভ প্রমুখের লেখার মধ্যে। তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ‘ফোর আর্টস’ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ফোর আর্টস ক্লাব দু’বছর পরে উঠে গেলে এর প্রাক্তন সদস্যরাই ‘কল্লোল’ পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ প্রকাশ পায় কল্লোল পত্রিকা। ‘কল্লোল’(১৩৩০), ‘কালিকলম’(১৩৩৩) ও ‘প্রগতি’(১৩৩৪)— এই তিন পত্রিকার তরুণ লেখকবৃন্দ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক নামে পরিচিত। এঁরা হলেন দীনেশ রঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, মনীশ ঘটক ওরফে যুবানাশ্ব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আমরা কল্লোল গোষ্ঠীর বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করেছি মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের লেখায় ইউরোপ ঠিক কীভাবে এসেছে। তবে এই সমস্ত লেখকদের সমস্ত রচনাই এসেছিল মুখ্যত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে কোন কোন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকের চিন্তাধারায় সংশয়, অবক্ষয়, দেহচেতনা ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব তাঁদের গল্প-উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, এঁদের প্রতিও বাংলার তরুণ লেখকদল আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডি

এইচ লরেন্স ও অলডাস হাক্সলি। অলডাস হাক্সলি যুদ্ধোত্তর জীবনের কৃত্রিম বন্ধ্যারূপ, বুদ্ধিজীবীদের জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও স্ববিরোধিতাকে তাঁদের গল্প উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজি কথাসাহিত্যের জেম্‌স জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, ডরোথি রিচার্ডসনের ব্যবহৃত Stream of consciousness-এর প্রভাব অনেক বাঙালি লেখকের লেখায় পড়েছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নুট হামসুনের 'প্যান' উপন্যাস অবলম্বনে রচনা করেন 'বেদে'(১৯২৪)। উপন্যাসের নায়ক কাঞ্চন নয় বছর থেকে একুশ-বাইস বছর পর্যন্ত যেমন ছন্নছাড়া বেদের ন্যায় নানা বর্হির্মুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, ঠিক তেমনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে একের পর এক ছয়জন নারী— আহ্লাদী, আসমানী, বাতাসি, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ীর সংস্পর্শে এসেছে এবং তাদের ভালোবেসেছে। কিন্তু তার ভালোবাসা কোথাও একনিষ্ঠভাবে একজনের কাছে আটকে থাকেনি, মন থেকে কোথাও পরিতৃপ্তি পায়নি। আসলে কাঞ্চনের মধ্যে সেই যুগের হতাশা, ব্যর্থতা ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে মুক্তির পিপাসা কাজ করেছে। আর তার ফলে উপন্যাসের মধ্যে কোথাও কোথাও যৌন চেতনার আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। 'ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নরনারীর হৃদয়ের এই বহুগামিতাকে লক্ষ্য করেছেন। নরওয়ের সাহিত্যে বিশেষভাবে ন্যুটহামসুনের কথাসাহিত্যে নরনারীর হৃদয়ের এই বহুকামিতার, মিথুনাসক্তির উল্লেখ আছে এবং মনে হয় বেদে উপন্যাসে তার প্রভাব আছে।'[৭]

'পাঁক' উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র কেবল পঙ্কিল পরিবেশের চিত্রই তুলে ধরেন নি, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সে পথ হল সমাজতন্ত্রের পথ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ভাবাদর্শ ও মার্ক্সীয় চিন্তা-ধারা যুদ্ধোত্তর যুবামানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছিল। চারিদিকে ব্যর্থতা, হতাশা ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির একটা নতুন আশ্বাস বহন করে নিয়ে এসেছিল এই সমাজতন্ত্রের বাণী। তারই আদর্শ প্রতিনিধি হলেন পাঁক উপন্যাসের বিলেতফেরত অশান্ত কর্মকার। তিনি অক্সর্ফোডের এম. এ. ডিগ্রি পেয়ে ইকনমিক্সে প্রথম স্থান নিয়ে সেখানেই অধ্যাপনার সুযোগ পেলেও তা প্রত্যাখ্যান করে চলে আসেন দেশে। এখন তিনি সমাজের দুঃখ-দারিদ্র দূর করতে চান, কিন্তু সাহেবে সঙ্গে

তার মত ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, 'দেশ দেশ করে চেঁচালে দেশের উন্নতি হয় না। আর যদি বা দেশ এই চিৎকারেই হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়ে তাতে কী লাভ? মজুরের মুখের ভাতে পুষ্টিকর উপকরণ কতটুকু বাড়বে? চাষার ভাঙা চালায় ক-টা ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির জল আর শীতের হাওয়া আশা নিবারণ হবে? কুলির কদর্য, নোংরা, মানুষের বাস করার অযোগ্য বস্তির কতটুকু শ্রী ফিরবে?' [৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা ও চেতনা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখায় বিপুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। একাধিক গল্পে আমরা এর প্রমাণ পেয়ে থাকি। এরকমই একটি গল্প 'স্টোভ'। যুদ্ধোত্তর কালে নরনারীর মনের জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখলেন মানুষ আজ অনেক পরিমাণে বিকৃত ও অসুস্থ। তার প্রেমচেতনা সহজ-স্বাভাবিক নয়। দ্বিধা, সংশয়, অবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব মানুষের সহজাত যৌবনবৃত্তিকে বিচিত্র ও জটিল করে তুলেছে। 'হয়তো' (১৯৩২) গল্পে মহিম ও লাবণ্যের দাম্পত্যের সম্পর্ক জটিল ও রহস্যময়। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হৃদয়ের মধুর সম্পর্ক অনেক দূরের কথা, প্রতি মুহূর্ত সন্দেহ করে গেছে। মহিম লাবণ্যকে ভালোবাসে, আবার গভীরভাবে সন্দেহও করে। সেই সন্দেহের বিষাক্ত বাতাস সমগ্র গল্পজুড়ে বয়ে চলে। 'কী বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কী তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালোবাসিয়াছে কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! ... ভালোবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কী?'[৯] আর এই চিন্তা থেকেই একটি দুর্যোগের রাত্রে এক ভাঙা সেতু থেকে মহিম লাবণ্যকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

পঞ্চম অধ্যায়:

প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ

বাংলা ছোটগল্পের পথচলার পথে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম আমাদের কাছে উঠে আসে তিনি হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি মূলত 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকার পাতায়।

প্রভাতকুমার কতগুলি ইউরোপীয় পটভূমিতে গল্প লিখেছেন সেইগল্পগুলির প্রধান চরিত্র ইংরেজ কিংবা বিদেশিনী। তিনিই প্রথম বাংলা গল্পের ভূগোলকে সুদূর লন্ডন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বিদেশি পটভূমিকায় রচিত তাঁর এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকে যেমন বিস্তৃতি প্রদান করেছে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছে বিদেশি জীবনযাত্রা ও বিদেশি চরিত্রদের সঙ্গে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'র 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র, ১৩০৫, প্রদীপ) গল্পের মধ্যে দিয়েই তার শুভ সূচনা হয়েছে বলা যায়। পরবর্তীকালে 'ছদ্মনাম', 'মুক্তি', 'ফুলের মূল্য', 'পুনর্মূষিক', 'প্রবাসিনী' 'বিলেতফেরতের বিপদ', 'মাতৃহীন', 'লেডি ডাক্তার', 'কুমুদের বন্ধু', 'কুকুর ছানা', 'বিলাতী রোহিনী' ও 'সতী' প্রভৃতি গল্পগুলি ইউরোপের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। গল্পগুলিতে স্বাদের ভিন্নতার কারণ পরিবেশের বৈচিত্র্য এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য। এই চরিত্রের বৈচিত্র্য অবশ্য নিতান্ত বাইরের। প্রভাতকুমারের বিদেশি পরিবেশের গল্পে কোনও বহিরাগত স্বাদ নেই, আবহাওয়াও আমাদের পরিচিত। ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারের 'কুকুরছানা' গল্পের সেই অবুঝ ছোট মেয়েটির আবদার, লন্ডনের তুষার বৃষ্টির বর্ণনা ও হাইড পার্কে বেঞ্চির ভাড়া, 'ফুলের মূল্য' গল্পে জননী ও ভগিনীর Basement হল রান্নাঘর, আর সেই ঘরে কেকের গন্ধ, আবার 'মুক্তি' গল্পে সদ্য আগত ভারতীয় ছাত্রের অস্বস্তি ও পরে উদ্‌গতপক্ষ পতঙ্গের মতো আচারণ— সমস্ত বর্ণনাই সার্থক। বিলেতের এত নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা অন্য কোনও বাংলা গ্রন্থে এত সার্থকভাবে বোধহয় নেই। বেজোয়াটারের রুমস্, লাডগেট সার্কাসে টমাস কুকের অফিস, মার্বল আর্চ, সার্পেনটাইন দীঘি, ভিক্টোরিয়া স্টেশন— সমস্তই যেন স্বাভাবিকভাবে কাহিনির মধ্যে এসেছে, কোথাও আরোপিত বলে মনে হয় না।

প্রভাতকুমারের ইউরোপের মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সহজ স্নিগ্ধ ও রমণীয় রূপটিকে আমরা খুঁজে পাই। সেখানে বিদেশি ল্যান্ডলেডির সেবা-যত্ন, বিদেশি বন্ধু, ভারতীয় ছাত্রের প্রেম, বিদেশির ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি হয়ে উঠেছে গল্পের বিষয়। আসলে তিনি ইউরোপীয় মানুষের মধ্যেই ভারতীয় মানুষের হৃদয়কে পেয়েছেন। আর ইংরেজের রমণীর মধ্যে ভারতীয় জননীর স্নেহ-ভালোবাসাকে খুঁজে পেয়েছেন। একজন মধ্যবিত্ত দরিদ্র ইউরোপীয়র হৃদয়ও বাঙালি হৃদয়ের মতোই একেই ব্যথায় ব্যথিত, একেই আনন্দে আনন্দিত— একথাই যেন প্রভাতকুমারের এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ছদ্মনাম' গল্পে সতীশ বলেছে- 'বিলাত থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া সমস্ত ভাল বাঙলা বই মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পরে লেখা অভ্যাস করিয়াছে।'[১০] আবার 'মাতৃহীন' গল্পের গল্পকথক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন।

ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে পারদর্শী বিলাতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী সমাজের কাছে 'চৌধুরী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। এই 'চৌধুরী সাহেবে'র পক্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চা এক আশ্চর্য ঘটনা বলা চলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম অনূদিত গল্প 'ফুলদানি' সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৮ সালে এবং প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ সালে। তবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে, গল্প রচনায় সার্থকতার মূলে আছে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৭) পত্রিকা। 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি তেমন কোনও মৌলিক গল্প রচনা না করলেও এর দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই বেশকিছু গল্প প্রকাশ করতে শুরু করেন। ফলে পাঠকের হাতে এসে পৌঁছাতে শুরু করে একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) ও 'আশুকথা'র (১৯৩৯) মতো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। এছাড়াও আমরা পরবর্তীকালে প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'গল্প-সংগ্রহ' গ্রন্থ পেয়ে থাকি। এখানেও প্রায় ৩৮টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলিত হয়েছে। এইসব গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর ইউরোপ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে 'ফুলদানী', 'প্রবাসস্মৃতি', 'চার-ইয়ারী কথা', 'প্রিন্স', 'মেরি ক্রিসমাস্', 'ধ্বংসপুরী', 'অদৃষ্ট', 'ঝাঁপান খেলা', 'বীরপুরুষের লাঞ্ছনা', 'গল্পলেখা', ভূতের গল্প', 'ভাববার কথা', 'পূজার বলি' ইত্যাদি গল্পে।

আমরা প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি, তাতে ইউরোপীয় প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ কতটা এসেছে, আর এলে তা কীভাবে এসেছে। উনিশ শতকেই অনেকে বিলেত থেকে সাহেব-সুবা হওয়ার চেষ্টা স্বরূপ অতিরিক্ত মদ্যপান (প্রবাসিনী গল্পের অতুল চন্দ্র মিত্র), বিলাতি সাজ-পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতেন। আবার পড়তে গিয়ে অনেক প্রবাসী বাঙালি বিলাতি মেয়ের প্রেমে পড়া, বিয়ে করা, ফিরে আসার সময় ইউরোপের মাটিতে প্রেমিকাকে রেখে এসে স্বদেশের মাটিতে সেই আদি প্রেমের স্মৃতি রোমান্থন করা ইত্যাদির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। যেমন প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা' গল্পের গল্প কথকের বিলেত প্রেমিকার কথা গভীর রাতে মনে পড়ায় একাকি ফোন কানে তুললে যে অভিজ্ঞতা হয় তার কথা অন্য তিন বন্ধুকে জানায়- ''হ্যালো' 'হ্যালো' করবার পর একটি অতি মৃদু অতি মিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আমার কানে এল ... আস্তে আস্তে সব মিলিয়ে যায়।''[১১]

বাংলার রক্ষণশীল সমাজ কখনও কখনও এইসমস্ত বিলাতফেরতদের 'একঘরে' করে রাখলে 'প্রায়শ্চিত্ত' করে রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপস করতে ও দেখা যেত। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে এই বিলেতফেরদের উচ্চশিক্ষার কারণেই হোক বা সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই হোক বঙ্গীয় রক্ষণশীল সমাজ সমাজচ্যুত করার পরিবর্তে তাদের প্রতি ক্রমশ সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে– প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিলেত ফেরতের বিপদ' গল্প তার অন্যতম উদাহারণ। এছাড়াও আমরা অনেক গল্প ও উপন্যাস পেয়ে থাকি যা বাংলা কথাসাহিত্যকে এক ভিন্নস্বাদের মাত্রা এনে দিয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম

ব্যঙ্গ-কৌতুকে ইউরোপ

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কর্মজীবনে বিলাত যাত্রা করেন। তখন তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারি কিউরেটর পদে ছিলেন। সরকারি কর্মজীবন থেকে অবসরের কয়েক বছর পরে তিনি রচনা করেন 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভৌতিক চরিত্র স্কল ও স্কেলিটনকে অবলম্বন করে লেখক ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন ইংরেজের অনুকরণপ্রিয় দেশের এক শ্রেণীর মানুষকে, যারা নকল সাহেবিয়ানাকে মনে করেন তাদের সামাজিক মর্যাদার সূচক। স্কল ও স্কেলিটনের মাধ্যমে এদেশের একশ্রেণীর ইঙ্গভাবাপন্ন মানুষের ইংরেজি কেতাদুরস্থ প্রথাপ্রীতিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করতে গিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক যুগের পুরুষকার অলজ্জ মানসিকতা এবং নিজেদের যুক্তি-বিচারবুদ্ধি ও মর্যাদায় অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধাকে ব্যঙ্গের উপকরণ হিসেবে নিয়েছেন লেখক। তাদের কোম্পানির ইংরেজি নাম রাখার যুক্তি তারা এভাবে দেখাতে চেয়েছে, 'যদি নাম রাখিতাম "খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানি' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। ... যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, "লংম্যান এন্ড কোং" অথবা গুডম্যান এন্ড কোং। ... দেশী দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে না! আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না।'[১২] প্রসঙ্গত মনে আসে এদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের ইঙ্গনবীশী ও অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা বিষয়ে বিবেকানন্দের উক্তিঃ বরফ খাওয়ার ফলে জাত যাওয়া সংস্কারের প্রতি লেখকের তীব্র কটাক্ষ বর্শিত হয়েছে। খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'একটু বরফ খাবে গদাধর?' আমি বলিলাম, 'না দাদা ঠাকুর। আমি বরফ খাইব না, বরফ খাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।[১৩]

সাহেবিয়ানা ছিল তৎকালীন সমাজের আর একটি বিশেষত্ব। পদানত ভারতবাসী ইংরেজি জানার মোহ ত্যাগ করা দূরের কথা বরং অন্ধ হয়ে ইংরেজি জানায় আত্মসমার্পণ করে গর্ববোধ করত। কোম্পানির নাম থেকে শুরু করে নিজের নাম পর্যন্ত ইংরেজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা করত। কোম্পানির নাম ইংরেজিতে রাখার কারণ, 'তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। বরং ইংদ্রুজ, পিংদ্রুজ দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে না!'[১৪] জাতীয় জাগরণের কালে, মানুষের এই জাতীয় বিজাতীয়সুলভ মনোভাব ও আচারণ, মানব চরিত্রের এক হাস্যকর অসংগতি, ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রুপ-কটাক্ষে জর্জরিত হয়েছে।

পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা'র প্রকাশ ১৯২২ সালে। এর সমসাময়িক পূর্বে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৯), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ইত্যাদি ঘটনা। এর ফলে একদিকে দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে কবলিত ভারতবাসীর দারিদ্র, বেকারত্ব ভারতবর্ষকে এক গভীর সংকটের মুখে ফেলেছিল। এই সময় সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পরশুরাম এই মধ্যবিত্ত জীবনের কতগুলি বিশেষ দুর্বলতা ও মিথ্যাকে অহরহ প্রত্যক্ষ করেছেন, যাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি, আর তাকেই যেন গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। ব্যাবসা, ধর্ম, প্রেম, দাম্পত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি মানুষের সর্বপ্রকার ভণ্ডামি, ভাববিলাসিতা ইত্যাদিকে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি ও অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তার অব্যবহিতপরে ও শান্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি একাধিক গল্প রচনা করেছেন। পরশুরামের লেখা গল্প সংখ্যা একশ আটটি এবং গল্পগ্রন্থ সংখ্যা ন'টি। গল্পগ্রন্থগুলি হল— "গড্ডলিকা", "ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প", "গল্পকল্প", "কজ্জলী", "আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প", "চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প", "হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প", "নীলতারা ইত্যাদি গল্প", "কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প"।

সপ্তম অধ্যায়:

দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ১৯১৯ সালে বিলেতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় বিদেশে তিনি যা দেখতেন, তাতেই পুলক জাগত তাঁর রোমে রোমে। প্রথমে দেশছাড়া হয়ে জাহাজে ওঠে জলের মরুভূমির দিকে তাকিয়ে বন্ধুহীন অবস্থায় তিনি মনমরা হলেও পরে বিলাতে পৌঁছানোর পর তাঁর বিস্ময় আর আনন্দে মন ভরে যায়। বিলাতে ইংরেজ বন্ধু পেতে দেরি হলেও লন্ডনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তার এক চেনা বাঙালির সাক্ষাৎ পেয়ে সেই অভাব পূরণ হয়। তার নাম দিয়েছিলেন শৌখিনবাবু। এই শৌখিনবাবুই তাকে পরবর্তীকালে লন্ডনের থিয়েটারে, মিউজিক হলে, কার্নিভালে, হিপোড্রামে, নাইট ক্লাবেও নিয়ে যেতেন। এরপর আরও নানা জনের সংস্পর্শে ও বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রায় সাড়ে-তিন বছর বিলাতে কাটিয়ে দেন। এরপর তাঁর দেখা হয় রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনিই দিলীপকুমারকে কেমব্রিজে নিয়ে গিয়ে নানা কলেজে ভর্তির চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বন্ধু শ্রীঅমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ফিটজ উইলিয়াম কলেজে ভর্তি করান।

দিলীপকুমার বিলাতের ইংল্যান্ডে ছিলেন প্রায় দু-বৎসর। এর মধ্যে প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়েছিলেন কেমব্রিজে, বাকি সময়টা কখনও লন্ডনে, কখনও নানা রম্যস্থানে, কখনও প্যারিসে, সুইজারল্যান্ডে, হলান্ডে, রাইন উপত্যকায়। তৃতীয় বৎসরে বার্লিনে গিয়ে গান ও জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। তারপরে লুসানো, ভিয়েনা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে, গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে ১৯২২-এর শেষে দিকে। প্রায় সাড়ে তিন বছরে তিনি অজস্র লোকের সঙ্গে মেলামেশায় উল্লাস আর অফুরান্ত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। সেই সময় তিনি অগুনতি গান গেয়েছিলেন, বই পড়েছিলেন এবং ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন।

দিলীপকুমারের কাছে ইউরোপের বাণী— ইহলৌকিকতা, কর্মে আসক্তি, উৎসাহে অনুরাগ। গায়ক হয়ে তিনি ভিয়ানা, প্রাগ, বুদাপেস্ত প্রভৃতি নানা শহরে ভারতের মহিমা প্রচার করতে শুরু করেন। এতে তাঁর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, শ্রেষ্ঠ বাণী, শ্রেষ্ঠ ভোগ, শ্রেষ্ঠ সঙ্গ সবই ভাগ্যে লাভ হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "আমি স্বভাবে অকৃতজ্ঞ নই, তাই সানন্দেই স্বীকার করব যে, য়ুরোপের কাছ থেকে অনেককিছুই পেয়েছিলাম যা আমার অন্তর্জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু বলব যে, য়ুরোপের আবহে আমি একটু একটু করে অতিষ্ঠই হয়ে উঠেছিলাম।..."[১৫] তাই শেষ পর্যন্ত দিলীপকুমার বিলিতি ডিগ্রি না নিয়েই একজন জনপ্রিয় গায়ক হয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি ইউরোপে থাকাকালীন একাধিক লেখকের বই পড়েছিলেন, যেগুলির দ্বারা তিনি কোনও না কোনোভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম দুটি রোলাঁর 'জন ক্রিস্টফার' ও রবার্ট রাসেলের 'Roads to Freedom'।

দিলীপকুমার রায় এই ইউরোপীয় জীবন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বেশকিছু উপন্যাস লিখেছেন— এগুলি হল 'মনের পরশ' (১৯২৬), 'বহুবল্লভ' (১৯৩৫), 'দোলা' (১৯৩৫-৩৬), 'দু-ধারা' (১৯৩৫), 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' (১৯৩৮)। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ আমাদের মনেকে কীভাবে সাড়া দেয় সেটাই খানিকটা বাস্তব ও খানিকটা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে দেখিয়েছেন। এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার জন্য অনেকে বিলাতে যাওয়ার কথা ভেবে থাকলেও ব্যারিস্টারি পড়াই ছিল প্রধান। ব্যারিস্টারি পড়া সেকালের সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। সেকালে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া যে কতটা মোহ ছিল তা তাঁর একাধিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কথায় স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, আর তা সে ওকালতি ব্যাবসা করুক বা না করুক। যেমন দিলীপকুমারের 'মনের পরশ' উপন্যাসে পল্লবের পিতা পল্লবের সঙ্গীত শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন, "...আমার বক্তব্য বা অনুরোধ, আদেশ নহে— যে তুমি সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ ব্যারিষ্টারিটিও পাশ করিয়া আসিও।"[১৬]

অষ্টম অধ্যায়:

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায় আই. সি. এস.-এর প্রশিক্ষণ সূত্রে ইউরোপের মাটিতে পা রেখেছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেখানের মানুষের জীবনের গতিধারা ও সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। অথচ তিনি ভারতীয়, একজন বাঙালি। দেশ জাতি সম্পর্কে তাঁর বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রগতিশীল ভাবনা ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে ছিল জীবন ও সংস্কৃতিতে। আসলে জীবন ও সংস্কৃতির চিন্তাকে তিনি কোনও গণ্ডির মধ্যে রাখতে চাননি।

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে অনেক চরিত্রকে পাই, যারা ভারত থেকে ইউরোপে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। তারা ইউরোপের মেধাবী ছাত্রদের পাশে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ কর্মসংস্থানও অর্জন করেছে। আবার কেউবা ইউরোপকেই তাদের হৃদয়স্থলের আবাসভূমি করে তুলেছে। আবার ইউরোপ থেকে অনেকেই ফিরে এসেছে এসেছে ভারতমাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে— এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। তারা ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করতে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে। ফলস্বরূপ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন চেতনায় সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে অনেক ভারতীয় তথা বাঙালি মানুষের জীবন চেতনা এমনভাবে মিশে গেছে যেন ভারতের মানুষ আর ইউরোপের মানুষ একই পরিবারের অংশ। দেখা যায় অনেক বাঙালি বঙ্গদেশে থাকলেও তাদের গড়ে ওঠা বা বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডে। তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবনবোধ। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও সংস্কৃতি অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় একরকম নতুন জীবনবোধকে খুঁজেছেন।

অন্নদাশঙ্কর ইউরোপীয় পটভূমিকায় একাধিক উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– i. আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০), ii. সত্যাসত্য, (১৯৩২-৪২) iii. পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩) প্রভৃতি। এইসবের মধ্যে 'সত্যাসত্য' ছয়টি খণ্ডে সমাপ্ত একটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২)-এর ভূমিকায় লেখক উপন্যাসের সৃষ্টির প্রেরণা, উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র বিশ্লেষণে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস লস্ট রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব পছন্দ করে না। তাই তাদের বলে সত্যাসত্য।"[১৭] ইউরোপ সম্পর্কে লেখকের এই মানসিকতার ফলেই তিনি তাঁর এপিক উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইউরোপকে। তাই বাদল বলেছে— "আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরেজ।" [১৮] সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে– "Decline of the west বাজে কথা; ইউরোপের কখনো বার্ধক্য আসতে পারে? ইউরোপ চিরযৌবন।"[১৯] ইউরোপীয় জীবনপটের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শ ও চিন্তাভাবনাকে যুক্ত করে যুদ্ধোত্তর মননশীল মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা কীভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে তারই ব্যপক ও জটিল রূপচিত্র এঁকেছেন অন্নদাশংকর তাঁর 'এপিক'ধর্মী 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে। 'সত্য' ও 'অসত্যে'র রহস্য সন্ধানে লেখক ইউরোপের পরিবেশে উপন্যাসের নায়ক বাদল চরিত্রের মাধ্যমে নানা বির্তক, আলোচনা, চিন্তা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের জটিল সমস্যার আলেখ্য তুলে ধরেছেন।

উপসংহার

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের ধরণ ধারণও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালির মানসপটে যে পরিবর্তন শুরু হয় তা পূর্ণতা পায় বিশ শতকের প্রথমদিকে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে। উনিশ শতকের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ শতকের সংশয়, সন্দেহ, জীবন জিজ্ঞাসা ও যুক্তির দাবি ইত্যাদি বাঙালির মন ও মানসিকতায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র বিরোধী হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাজের চোখে তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিলাত যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বিলেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলেত তথা ইউরোপ আর সাত সমুদ্রের দূরত্ব বলে মনে হয় নি। কারণ সেখানে বাঙালি গিয়ে পড়াশুনা ও চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন জীবিকার্জনের জন্য নিয়মিত যাতায়ত করছে।

অন্যদিকে, এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভারতভূমিতে পড়ে কারণ ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। ফলে ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে কালান্তরের আভাস বয়ে আনে। ইউরোপীয় রাজনীতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অব্যবহিত পরে রুশ বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজের ভিত টলে যায় ও অর্থনীতিতে প্রবল চাপ পরে। এই অর্থনীতি কাঠামোর সঙ্গে সেখানকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায় মানুষের মনে দেখা দেয় সংশয়, হতাশা, দোলাচলতা। এই দোলাচলতার মধ্যে থেকে লড়াই চলতে থাকে, সারাজীবনে ভিতরে ও বাইরে। অনেক গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেও আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থতা, হতাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছাপ প্রত্যক্ষ করি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইউরোপের প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য তার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের বিশ্বকে প্রাণভরে স্বাগত জানিয়ে বাঙালিত্ব বনিয়াদের উপরে গড়তে তুলতে চেয়েছিল নতুন ধরনের ইমারত।

উৎস নির্দেশ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ১১৩

২. তদেব

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ২১৩

৪. দেবী, স্বর্ণকুমারী, *কাহাকে* (ভূমিকা সুদক্ষিণা ঘোষ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা-.২২

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪

৬. দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ১১৫-১১৮

৭. বসু, দেবকুমার, *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৬৯

৮. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ (সম্পা.), *প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন,* মিত্র ও ঘোষ পার্বলিশার্স প্রা: লি:,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৬৮

৯. ভট্টাচার্য, সৌরীন (সম্পা.), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা- ৫২

১০. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *গল্প সমগ্র* (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ২৪৮

১১. চৌধুরী, প্রমথ, *গল্পসংগ্রহ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১২, পৃষ্ঠা- ৭৩

১২. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১০২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

ঘোষ, বারিদ বরণ। *রচনা সংগ্রহ দিলীপ কুমার রায়* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *আমার ইউরোপ ভ্রমণ* । পরিমল গোস্বামী (অনুবাদ)। নব গ্রন্থনা। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

মল্লিক, সন্দীপন। *অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্য ও প্রসঙ্গিক ভাবনা* । বাংলা একাডেমী। ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)*। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮১

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস* । ওরিয়েন্ট লংম্যান। কলকাতা। ২০০৭

মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন। *ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস* । প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা ২০০৫

মুরশিদ, গোলাম। *কালাপানির হাতছহানি বিলেতে বাঙালির ইতিহাস* । অবসর। ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮

সেন, সীমন্তী। *কৃষ্ণভাবিনী দাসের ইংল্যাণ্ডে বঙ্গমহিলা* । স্ত্রী। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ :

Das and Chattopadhyay, Suranjan Basudeb. *EUROPE AND THE HUGHLI: The European Settlements on The West Bank of the River,* K P Bagchi & Company: 2014, Kolkata 12.

Sen, Simonti. *Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910,* Orient Longman: First published 2005, New Delhi 110002.

তত্ত্বাবধায়ক সহ-তত্ত্বাবধায়ক গবেষক